মাছ

English

মাছ (Fish) পাখনা ও সাধারণত দেহের উপরিভাগে আঁশযুক্ত, ফুলকাবিশিষ্ট জলচর মেরুদন্ডী প্রাণী। মাছকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা: Agnatha, Chondricthyes, Osteichthyes এবং *Placodermi*। *Agnatha*-তে অন্তর্ভুক্ত আদিম চোয়ালহীন Cyclostomes (lampreys, hagfishes) এবং বিলুপ্ত Ostracoderms। Placodermi- চোয়ালযুক্ত বিলুপ্ত বর্মাবৃত মাছ; Chondricthyes- হাঙর, রে (Ray) ও অন্যান্য কোমলাস্থির মাছ, যাদের সবগুলিরই প্রধানত কোমলাস্থিময় কংকাল থাকে; এবং Osteichthyes- অস্থিময় মাছ, যাদের সিংহভাগই খাবার উপযোগী। কতগুলি জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণীর নামের সঙ্গে 'মাছ' নাম ব্যবহার করলেও সেগুলি প্রকৃত মাছ নয়। উদাহরণ হিসেবে, কাটলফিশ (Cephalopoda শ্রেণীর mollusk, অক্টোপাসের সগোত্র), জেলিফিশ (coelenterates), স্টারফিশ বা তারামাছ (echinoderms) ও শেলফিশ (অয়েস্টার ও ক্ল্যাম জাতীয় mollusk) এবং ক্রে-ফিশ (arthropod) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

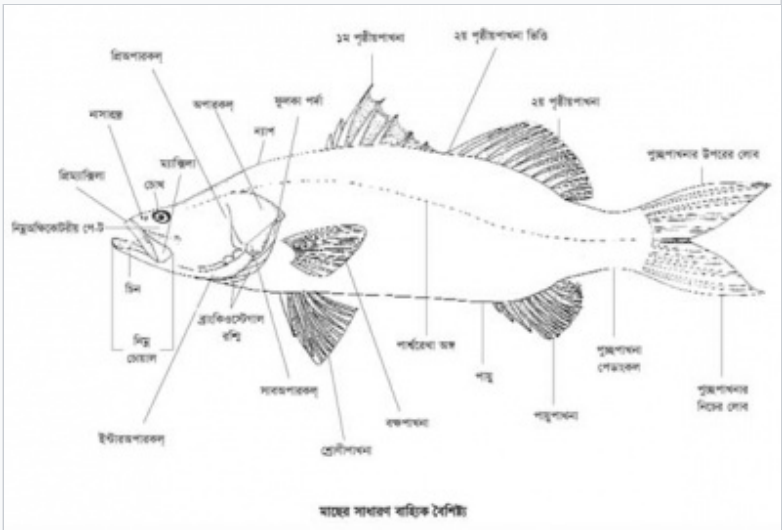

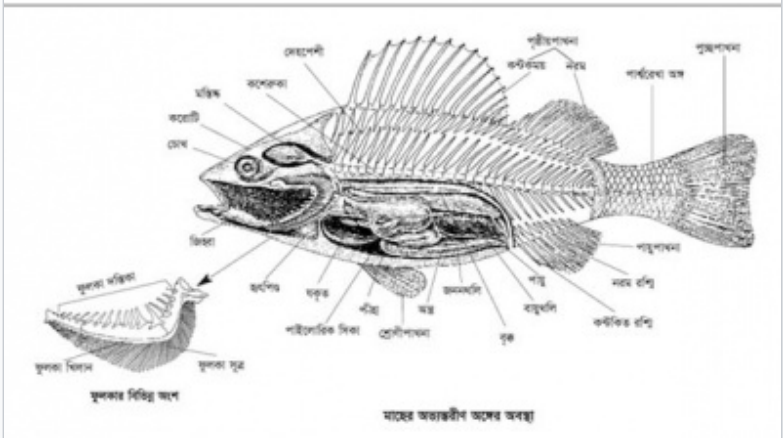

অস্থিময় মাছ দুই দলে বিভক্ত: মাংসল পাখনাযুক্ত (Crossopterygii) ও পাখনারশ্মিযুক্ত (Actinopterygii)। জীবিত মৎস্য প্রজাতির ৯০ শতাংশের বেশি শেষোক্ত দলভুক্ত। আদিম অস্থিময় মাছেরও মাংসল পাখনা ছিল। ব্যাপক খরা ও জলাবদ্ধতার সময় এদের উৎপত্তি এবং এগুলি থেকেই উভচর (ডাঙ্গার প্রথম মেরুদন্ডী) ও পাখনারশ্মিযুক্ত মাছের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। মাংসল পাখনাযুক্ত মাছের মধ্যে এখনও টিকে আছে লাংফিশ (lungfish)। এদের মধ্যে সিলাকান্থ (Coelacanth) মাছের একটিমাত্র প্রজাতি টিকে আছে। এদের দেহে রয়েছে আদিম অস্থিময় মাছের কিছু কৌলিক চিহ্ন ধারক হাড়সহ মাংসল পাখনা (ভূচর মেরুদন্ডীদের উপাঙ্গের পূর্বসূরি), অভ্যন্তরীণ নাসারন্ধ্র ও ফুসফুস। বর্তমানে স্বাদু ও লোনা পানির পাখনারশ্মিধর মাছেরাই উন্নত শ্রেণীর মাছদের প্রতিনিধি। এরাই মাছের মধ্যে সর্বাধিক সফল ও বৈচিত্র্যময়, যাদের প্রায় সকলেরই সম্ভবত ফুসফুস থেকে পটকার উদ্ভব ঘটেছে।

পৃথিবীতে প্রায় ৪৫০ গোত্রে ২৯,০০০ প্রজাতির মতো মাছ রয়েছে, যাদের প্রায় ৪০% স্বাদুপানির বাসিন্দা। বাংলাদেশে ১৮ বর্গে ১২৩ গোত্রে ৪০২ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ আছে। এই ৪০২ প্রজাতির মধ্যে ৩ বর্গে ১৫ গোত্রে ৫৬

কোমলাস্থিময় মাছ (শ্রেণী Chondricthyes) এবং ১৫ বর্গে ১০৮ গোত্রে ৩৮৬ প্রজাতির অস্থিময় মাছ (শ্রেণী Osteichthyes) রয়েছে। প্রায় ১৪ বর্গে ৬১ গোত্রে ২৫১ প্রজাতির অন্তর্দেশীয় (inland) মাছ (স্বাদুপানি ও লোনাপানির) আছে। অন্তর্দেশীয় মাছের মধ্যে সর্বাধিক রয়েছে Cyprinidae গোত্রের (বর্গ Cypriniformes) অন্তর্গত; ২৫ গণভুক্ত ৬১ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে কার্প রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ ইত্যাদি; বার্ব পুঁটি, মহাশোল ইত্যাদি এবং মিনো দারকিনা, চেলা, মলা ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্বাদুপানিতে ৫৪ প্রজাতির ক্যাটফিশ টেংরা, আইড়, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি পাওয়া যায়। লোচ- রানি, গুতুম, পোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে কম (প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১২)। এক সময়ে জলাভূমিতে বিপুল সংখ্যক শোল, টাকি, গজার ইত্যাদি ছিল, বর্তমানে কম দেখা যায়। Channidae গোত্রের ৫ প্রজাতির মধ্যে ৩ প্রজাতিই বিপন্ন: পিপলা বা তিলাশোল (Barca snakehead, Channa barca) অতি বিপন্ন, গজার (Giant snakehead, Channa marulius) বিপন্ন এবং তেলোটাকি (Asiatic snakehead, Channa orientalis) বিপন্নপ্রায়। সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে পিপলা আছে, কখনও কখনও সর্ষেফুল ক্ষেতে যায় এবং খরায় কাদার নিচে ঢোকে, ডিম ও পোনা পিতৃমাতৃ স্নেহে লালন করে।

বাইম মাছের (সচরাচর ২-পার্শ্বস্থ ফুলকা ফাটলসহ) মধ্যে কুচিয়া (Gangetic mudeel, *Monopterus cuchia*) উদরীয় একটিমাত্র ফুলকা-ফাটলের অনন্য বৈশিষ্ট্যধর। এক সময় প্রচুর পাওয়া গেলেও বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। অপর একটি সুন্দর বাইম মাছ তারাবাইম (One-striped spiny eel, *Macrognathus aral*) বর্তমানে বিপন্ন। দুই প্রজাতির সাপ-বাইম (*Pisodonophis species*) স্থানীয় জনসাধারণ সচরাচর খায় না বলে এই মুহূর্তে বিপদমুক্ত আছে। বৃহত্তম বাইম মাছ বামোশ (বামছাড়া, বাও-বাইম, তেলকোমা) (Indian longfin eel, Anguilla bengalensis) মোহনা ও স্বাদুপানিতে পাওয়া যায়। নেত্রকোনায় ধৃত একটি বামোশ ছিল ১১৮ সেমি লম্বা, ওজন ৬ কেজির বেশি। মাছটি catadromous অর্থাৎ ডিম ছাড়ার জন্য নদী থেকে সমুদ্রে যায়। কাইক্কা বা কুমিরের খিল (Gar, Crocodile fish) ইত্যাদি মাছের মধ্যে pipefish (*Microphis deocata*) বর্তমানে বিপন্ন।

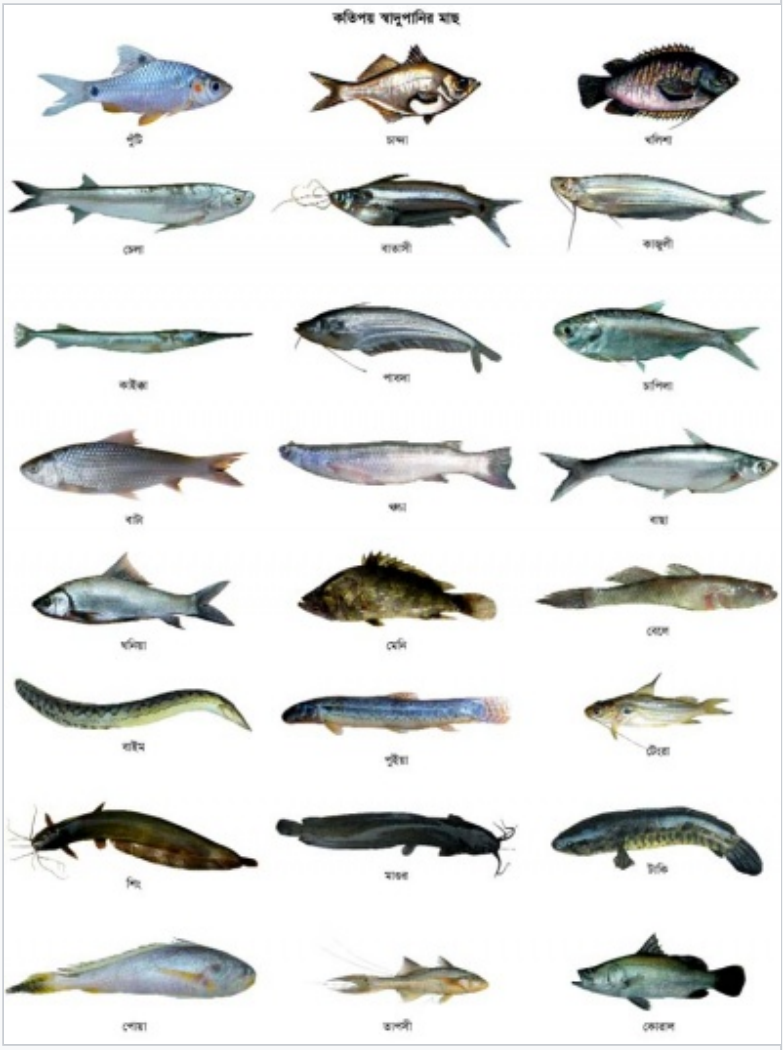

বাংলাদেশে ৭৬ প্রজাতির মাছকে প্রায়শ স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক মাছের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি-গুরুত্বপূর্ণ মাছ ইলিশ (Hilsa, Tenualosa ilisha) হলো anadromous, অর্থাৎ ডিম ছাড়ার জন্য সমুদ্র থেকে নদীতে আসে। অপরিণত ইলিশের স্থানীয় নাম জাটকা। নদীতে ফেব্রুয়ারি-মে মাসের মধ্যে জাটকা ধরা পড়ে। বড় নদীগুলি থেকে এই একটিমাত্র মাছই সর্বাধিক সংগৃহীত হয়। পুকুরে মৎস্যচাষে কার্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে সবচেয়ে পছন্দের মাছ হলো Anabantidae গোত্র ও Perciformes বর্গের কই (Climbing perch, *Anabas testudineus*)। অধিকাংশ Perciformes সামুদ্রিক হলেও বেশিরভাগ মাছই মোহনা ও নদীতে প্রবেশ করে, যেমন টাক-চামা (Pony fish), পোয়া (Jew fish), তপসী (Thread-fin), বাটা (Mullet), রূপচান্দা (Pomfret) ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ২৫১ প্রজাতির মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিভিন্ন ধরনের বিপদের মুখোমুখি; তন্মধ্যে ১২ প্রজাতির মাছ অতি বিপন্ন, ২৪ প্রজাতি বিপন্ন ও ১৪ প্রজাতি বিপন্নপ্রায়। তথ্যাভাবে ৬৭ প্রজাতির মাছের

অবস্থা মূল্যায়ন করা যায়নি। এই মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ ১৪৬ প্রজাতি বিপদমুক্ত। সামুদ্রিক মাছের অবস্থা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক উপাত্তের অভাবে এদেরও মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে ৪ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ বিপদের মুখে, একটি বিপন্ন– Pristidae গোত্রের আঁইশামাছ/করাত হাঙর (*Pristis microdon*) এবং তিনটি বিপন্নপ্রায়– সমুদ্রঘোড়া (*Hippocampus kuda*) ও কালা-হাঙর (*Carcharhinus limbatus*), Thunnus obesus, যেগুলি যথাক্রমে Syngnathidae, Carcharhinidae ও Scombridae গোত্রভুক্ত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশে প্রায় ১৫০ প্রজাতির বিদেশী মাছ আনা হয়। সেগুলির অধিকাংশই বাহারি বা অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ। এদের মধ্যে ১৩ প্রজাতি স্বাদুপানি ও স্বল্প-লোনাপানিতে চাষযোগ্য মাছ। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য লার্ভাভুক Gambusia মাছ আমদানি করা হয়। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বড়মাথা কার্প, সাধারণ কার্প, তেলাপিয়া, ক্যাটফিশ, থাইপাঙ্গাশ, থাই সরপুঁটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

এই উপমহাদেশে ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পুকুর ও হ্রদের মতো বদ্ধজলাশয়ে মাছচাষ চলছে। অবিভক্ত বাংলার মৎস্যবিভাগের পরিচালক সুন্দর লাল হোরা পুকুরে মৎস্যচাষের (১৯৩২-১৯৪৭) প্রথম সফল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাসের সাহায্যে কার্প মাছে কৃত্রিম প্রজনন শুরুর পর এদেশে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়। এক সময় বড় জাতের কার্প চাষই ছিল প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু বর্তমানে পুকুরে ও হ্রদে বহু বিদেশী মাছেরও চাষ চলছে।

বছরে মোট উৎপন্ন মাছের প্রায় ৩৯% মৎস্যচাষ থেকে এবং অবশিষ্ট ৬১% অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে অনেকগুলি মৎস্যচাষ প্রযুক্তি বিকশিত হচ্ছে, সমন্বিত পোল্ট্রি বনাম মৎস্য চাষ, সমন্বিত ধান-মাছ চাষ, কার্পের বহুবিধ চাষ, কার্পচাষে উন্নত নার্সারি লালন-কৌশল, গলদা (Giant fresh-water prawn, *Macrobrachium rosenbergii*) চিংড়ির একক ও মিশ্রচাষ, থাই-পাঙ্গাশের মিশ্রচাষ, খোঁয়াড় ও খাঁচায় মৎস্যচাষ ইত্যাদি।

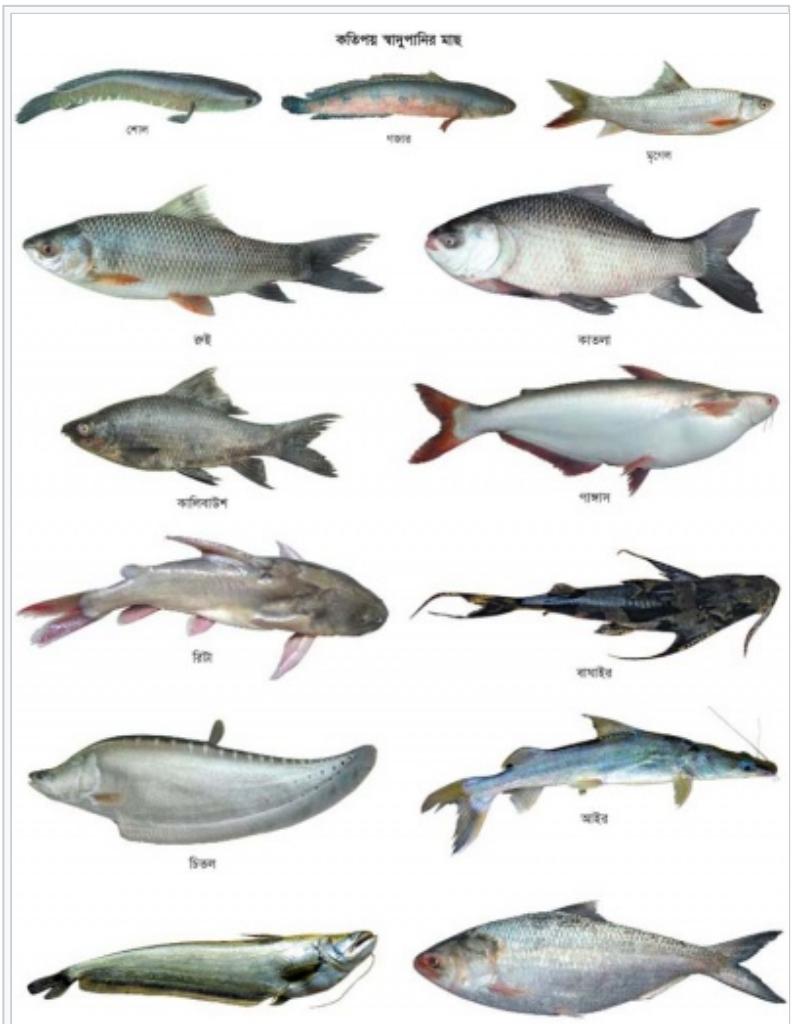

প্রায় ৪১ লক্ষ হেক্টর মুক্ত-জলাশয় (নদী, প্লাবনভূমি, বিল, হাওর, হ্রদ ইত্যাদি) এবং প্রায় ৩৫,০০০ হেক্টর বদ্ধজলাশয়ে (পুকুর) স্বাদুপানির মাছচাষ হয়। নার্সারিতে চারাপোনায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত পালনের জন্য পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর অর্ধশতাধিক ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র থেকে বড় জাতের কার্পের ডিম (প্রায় ২০,০০০ কেজি) ও পোনা সংগৃহীত হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন হ্যাচারি কৃত্রিম উপায়ে বছরে প্রায় ১০,০০০ কেজি ডিম উৎপাদন করে। স্বাদুপানির অনেকগুলি জলাধারে (পুকুর, হ্রদ, খানাখন্দ ইত্যাদি) মিশ্র মৎস্যচাষ চলে। মলা (*Amblypharyngodon mola*), পুঁটি (*Puntius chola*), খলিসা (*Colisa fasciatus*) ইত্যাদি দেশীয় ছোট মাছসহ কাতল (Catla catla), রুই (Labeo rohita), মৃগেল (Cirrhinus mrigala) প্রভৃতি বড়জাতের কার্পের চাষ বহুদৃষ্ট। জলাধারের প্রতি একক অংশে উচ্চফলনের লক্ষ্যে পুকুরে সিলভার কার্প, কমন কার্প, গ্রাস কার্প, ক্যাটফিশ, তেলাপিয়া ইত্যাদি বিদেশী মাছেরও চাষ হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সাতক্ষীরা জেলায় ও

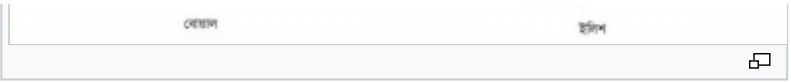

পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) ২৪ পরগণা সংলগ্ন বাংলাদেশের এলাকাসমূহে প্লাবিত ধান ক্ষেতে মৎস্যচাষ করা হয়। এভাবে ধানক্ষেতও মৎস্যচাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধান চাষের সঙ্গে Penaeid চিংড়ি ও Finfish চাষ এদেশের পুরনো রেওয়াজ। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলে স্লুইস গেট খুলে 'ঘেরে' স্বল্পলোনাপানি ঢুকিয়ে চিংড়ি ও পাখনাওয়ালা মাছের পোনা আটকানো হয় এবং নির্দিষ্ট আকারের না হওয়া পর্যন্ত পোনা ঘেরে বাড়তে থাকে। বর্ষা মৌসুমে (জুন-সেপ্টেম্বর) বৃষ্টির পানিতে লোনাপানির লবণাক্ততা হ্রাস পায়। কৃষকেরা জুলাই ও ডিসেম্বরের মধ্যে ধান ও মাছের মিশ্রচাষ করে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে পাখনাওয়ালা ও অক্টোবর-নভেম্বরে স্বাদুপানির গলদা চিংড়ি তোলা হয়।

বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষে খোঁয়াড় ও খাঁচায় বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ চালু হয়। আশির দশকের গোড়ায় ঝিনাইদহের বাহাদুরপুর বাঁওড়, নবগঙ্গা নদী ও সাগান্না এবং ঢাকা মহানগরের গুলশান ও ধানমন্ডি লেকে পরীক্ষামূলক খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয়। খাঁচা তৈরিতে জাল, বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি, টায়ারের রশি ও নাইলন দড়ি ব্যবহৃত হয়। প্রতি হেক্টরে ২০,০০০ কার্প– রুই, কালবাউশ, কাতলা, মৃগেল এবং চীনা কার্প মাছের মিশ্রচাষ ফলপ্রসূ হয়েছে। কার্প চাষের সঙ্গে চিংড়ি ও পাঙ্গাশের চাষ করা যায়। এক চাষচক্রে ০.৫০ হেক্টরের একটি খাঁচার চাষ থেকে প্রায় ৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত নীট মুনাফা অর্জন সম্ভব।

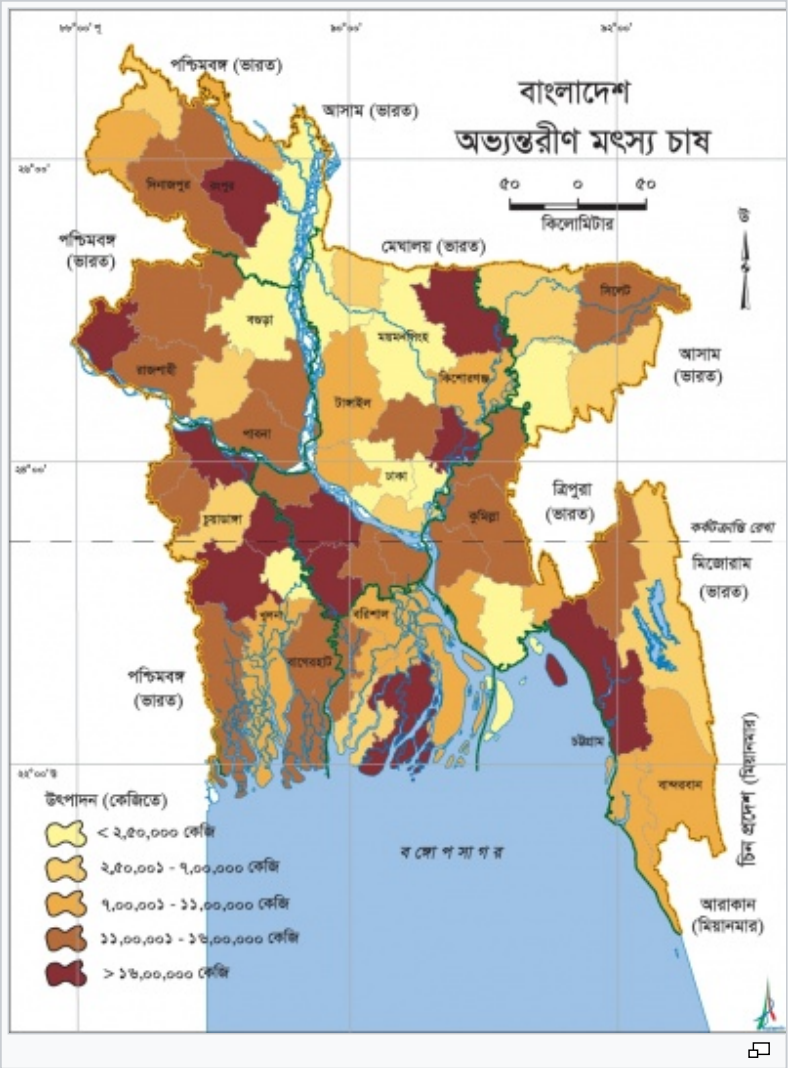

বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত তিনটি মৎস্য আহরণ অঞ্চল থেকে সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়। এগুলি দক্ষিণাঞ্চল (south patch), মধ্যাঞ্চল (middle ground) ও Swatch of no Ground। এগুলির মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলই সর্বাধিক উৎপাদনশীল। ২০০৬-০৭ সালে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৫১,৮৬৯ মে টন। বাংলাদেশে স্বাদুপানি ও লোনাপানি (স্বল্প-লোনাপানিসহ) থেকে যথাক্রমে ৮০% ও ২০% মৎস্যসম্পদ আহরিত হয়। মালাক্কা প্রণালীসহ বঙ্গোপসাগর প্রায় ২৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত। সর্বমোট জলপৃষ্ঠ এলাকার প্রায় ১৯% এলাকা মহীসোপান। এই এলাকার মধ্যেই অধিক মাছ শিকার করা হয়। উপকূল থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ২০ নটিক্যাল কিলোমিটার এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল রাষ্ট্রীয় জলসীমা থেকে ৩২০ নটিক্যাল কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিকার এলাকা প্রায় ২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যা দেশের মোট এলাকা থেকে বৃহত্তর।

বঙ্গোপসাগরে ৪৪২ প্রজাতির মাছ থাকলেও মাত্র ২০ প্রজাতির মতো মাছ বাণিজ্যিকভাবে সংগৃহীত হয়। সামুদ্রিক মৎস্য শিকার দুই প্রকার: উপরিভাগের ও তলদেশের। অধিকাংশ প্লাঙ্কটনভুক মাছই উপরিভাগের শিকারে ধরা পড়ে। এগুলি ইলিশ, ম্যাকারেল, রূপচাঁদা, ছুরিমাছ, লইট্টা, ভারতীয় স্যামন, মুলেট, অয়েল সারডিন, উপরিভাগের হাঙর, করাত মাছ, বাটার ফিশ, পাইক, বোনিটো, স্কিপজ্যাক, তপসী, স্মেল্ট, ভারতীয় অ্যানকোভি, ডোরাব হেরিং, ভারতীয় স্ক্যাড, ডগফিশ (ছোট জাতের হাঙর) ইত্যাদি। অধিকাংশ তলবাসী মাছ সমুদ্রতলে বা কাছাকাছি থাকে এবং এগুলি মাংসাশী বা জীববর্জ্যভুক। এগুলির কয়েকটি: পোয়া, ক্রোকার, ক্যাটফিশ, ফ্ল্যাটফিশ, পাইক, সী-ব্রিম্স, স্ন্যাপার, স্ক্যাভেঞ্জার, বাইম, গোটফিশ,

কাঁকড়াভুক, র‍্যাবিট মাছ, রকফিশ, সীবাস, গ্রাউপার, সিলভার ব্রিম, ছুরিমাছ ও তলবাসী হাঙর। বঙ্গোপসাগরে ২৪ প্রজাতির হাঙর পাওয়া যায়। জেলেদের ফাঁসজাল, গিঁটজাল, বাগজাল, লাইন-জাল ও টানাজালে হাঙর জড়িয়ে যায়, যদিও এগুলি শিকারের লক্ষ্য নয়। উপজাতীয়রা হাঙরের মাংস ও পাখনা খায়। সম্প্রতি রপ্তানির জন্য হাঙরের পাখনা প্রসেসিং চলছে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা, নদীর মোহনা ও স্বাদুপানিতে মাছ শিকারে বিভিন্ন ধরনের নৌযান ব্যবহৃত হয়। সমুদ্র ও স্বল্প-লোনাপানির ঐতিহ্যবাহী তিন ধরনের নৌকা আছে: সমুদ্রে বালাম, স্বল্প-লোনাপানিতে ডিঙ্গি ও চান্দি। কতকগুলি নৌকার স্থানীয় নাম: ডিঙি নৌকা, চান্দিনৌকা, কোষানৌকা, বড়খি-নৌকা ও সাম্পান। অগভীর পানিতে মাছশিকারে কতকগুলি ভেলাও ব্যবহৃত হয়, যেগুলি নানা স্থানীয় নামে পরিচিত: ভেলা, ভেরা, চালি, ভুরা ইত্যাদি। সমুদ্রে মাছ শিকারের জন্য সাইড ট্রলার, স্টার্ন-ট্রলার, বিম-ট্রলার, ওয়েট-ফিশ ট্রলার, ফ্রিজার ট্রলার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। টানাজাল টানার জন্য এগুলিতে শক্তিশালী ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি থাকে। প্রধানত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মাছশিকারের সমুদ্রগামী নৌযানগুলির মালিক। মাছধরা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিভিন্ন রকমের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহৃত হয়। অবশ্য, কিছু লোক সাজসরঞ্জাম ছাড়াই হাত দিয়ে মাছ ধরে। কেউ কেউ আঘাতের অস্ত্র, যেমন এককাঁটা, তেকাঁটা, আঙ্কা, কোঁচ ইত্যাদি দিয়ে মাছ শিকার করে। অনেকে প্রচলিত লম্বা সুতার টানা-বড়শি ব্যবহার করে। কেউ কেউ পানির তলায় লম্বা সুতার বড়শি ফেলে।

বাঁশের সরু কাঠি দিয়েও বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার ফাঁদ তৈরি হয়। এগুলিরই স্থানীয় কয়েকটি: চাঁই, বেগা, ডুবা-ফাঁদ, দারকি, উন্টা, তেপাই, ধীল, চেং, চারি, চান্দি বেড়, বানা, পলো, রাবানি, অঙ্গ ও চারো। জালের আকার, জাল পাতার স্থান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে নানা ধরনের জালও ব্যবহৃত হয় যেমন, বাগজাল (বেহুন্দি), টানাজাল/ঠেলাজাল, ভাসাজাল, ঝাঁকিজাল, ফলিং-নেট বা বড়জাল, ফাঁসজাল ও জড়ানো জাল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মৎস্যচাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছে পরজীবী সংক্রমণও বাড়ছে। এ পর্যন্ত ১৩০ বা ততোধিক মাছের পরজীবী পাওয়া গেছে। বহুদৃষ্ট প্রোটোজোয়াঘটিত রোগের মধ্যে রয়েছে: Icthyobodiasis, Ichthyophthiriasis, Chilodonelliasis, Trichodiniasis, Myxosporidiasis, Dactylogyriasis, Gyrodactyliasis, কালোদাগ রোগ (Diplostomiasis), হলুদ লার্ভা রোগ (Clinostomiasis), Ligulosis, Caryophyllidiasis, Piscicolasis, নোঙ্গরকীট সংক্রমণ (Ergasiliasis, Lernaeasis) ও মাছের উকুন রোগ (Argulosis)। এদেশে মাছের ভাইরাসঘটিত রোগের কোন নজির নেই। বহুদৃষ্ট ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগসমূহ হলো: Columnaris, রক্তদুষ্টি (শোথ), আঁশপড়া রোগ ও ফুলকাপচন রোগ। জানা মতে ছত্রাকঘটিত রোগ: Saprolegniasis, Branchiomycosis এবং Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)।

কার্প ও মাগুর মাছে (carp ও catfish) পুষ্টি ঘাটতিজনিত Lordosis/Scoliosis বা মেরুদন্ড বক্রতা রোগ দেখা দেয়, ফলে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় ও বিকলাঙ্গতা ঘটে এবং করোটির অস্থিক্ষয় ও মাথায় অস্থিগঠন না হওয়ার দরুন মাথায় ফাটল/ভাঙন রোগ সৃষ্টি হয়। অক্সিজেন বা নাইট্রোজেনের অতিসম্পৃক্তির জন্য ডিমের কুসুম, চোখ, ত্বক, ফুলকা ও মুখ, এমনকি পটকাতেও গ্যাস-বুদ্বুদ জমে এবং gas-bubble রোগের মতো পরিবেশগত রোগ দেখা দেয়। ১৯৯৮ সালে স্বাদুপানি ও মোহনার মাছ Epizootic Ulcerative Syndrome রোগে আক্রান্ত হয়। এই সংক্রামক রোগ কোষকলার গভীরে কোষক্ষয় ঘটায় ও তাতে মাছ মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ২১ জেলার একটিতেই ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার। পানির মধ্যস্তরবাসী মাছের তুলনায় তলবাসী মাংসাশী মাছেরা অধিক সংক্রমিত হয়েছিল। শোল জাতীয় মাছের মতো বায়ু শ্বসনকারী মাছেও সমান সংক্রমণ ঘটে।

মৎস্য দপ্তরের মতে ২০০৬-০৭ সালে সংগৃহীত সর্বমোট ২,২১,১৩১ মে টন মাছের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ ছিল শতকরা প্রায় ৪১ ভাগ। বদ্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ৩৯ ও ২০ ভাগ। মৎস্য খাতের অবদান জিডিপি'র ৪.৭%, রপ্তানি আয়ের ৪.৯% (২০০৬-০৭), প্রাণীজ প্রোটিনের ৫৮%। বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত পানিতে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের মধ্যে কেবল মাছই নয়, আছে চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, কচ্ছপ ইত্যাদিও। মৎস্যসম্পদ সংগ্রহে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োজিত, যা বাংলাদেশের সর্বমোট কর্মজীবী মানুষের প্রায় শতকরা ৭ ভাগ। সারা দেশে সামুদ্রিক মাছের চেয়ে স্বাদুপানির মাছেরই কদর বেশি। সরকারের অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য দপ্তর মাছ সংরক্ষণ, সংগ্রহের সময় নিয়ন্ত্রণ, জালের ফাঁসের আকার নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় দেখাশোনা করে এবং বিধি-বিধান তৈরি করে।

হ্যামিলটন বুকানন বাংলায় মৎস্যসম্পদের (১৮০৭-১৮১৩) অবনতি লক্ষ্য করেন, যা হান্টার তাঁর A Statistical Account of Bengal গ্রন্থে (১৮৭৭) বর্ণনা করেছেন। এতে উদ্ধৃত রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের পর্যবেক্ষণ ছিল এরকম: 'বিশ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে মাছের সরবরাহ অনেক কম। পোনা ও ছোটমাছের বিনষ্টি এবং ছোট

নদী ও বিল ভরাটের জন্যই এটি ঘটেছে। সরবরাহ কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাহিদা খুব বেড়ে গেছে, ফলে সঙ্গত কারণেই মাছের দাম আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। সন্দেহ নেই, ছোট পোনা ব্যাপকভাবে মারা পড়ছে।' আসামের দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার লক্ষ্য করেন, 'মাছ সরবরাহ যে কমছে তা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইদানিং মাছের দাম খুব বেড়েছে, মাছ ব্যবসায় মন্দা চলছে। এরই ফলে হয়ত ডোম-মৎস্যজীবীরা কৃষিকাজের দিকে ঝুঁকেছে... পুকুরে মাছচাষ তো হচ্ছেই না, অন্যদিকে মাছ ও পোনার যত্রতত্র বিনাশ চলছে। নদীতে ডালপালার ঘের বানানো থেকে নানা ফাঁদপাতাসহ সবকিছুই কাজে লাগানো হচ্ছে, আর জালের ফাঁস এখন এতো ছোট যে পোনা পর্যন্ত বের হতে পারে না। মাছের এখন টিকে থাকা দায়, তাই সংখ্যা তো কমবেই।'

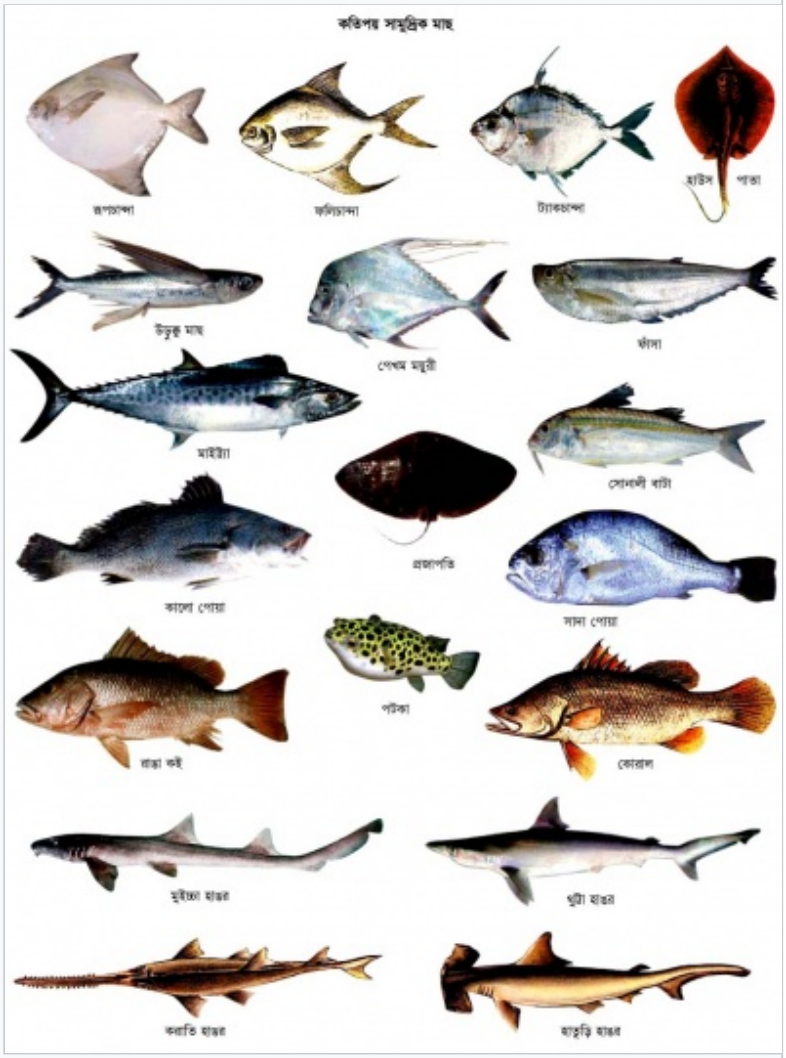

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে প্রণীত The East Bengal Protection and Conservation of Fish Act ক্রমান্বয়ে ১৯৬৩, ১৯৭০, ১৯৮২ ও ১৯৮৫-৮৮ সালে সংশোধিত হয়। সাধারণের কাছে Marine Fisheries Rules, ১৯৮৩ নামে পরিচিত The Marine Fisheries Ordinance ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়। Pond Development Act ১৯৩৯ হিসেবে পরিচিত The Tank Improvement Act, ১৯৩৯ সংশোধিত হয় ১৯৮৬ সালে। এই আইনবলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যে কোন অব্যবহৃত পুকুরের মালিককে যথাযথ নোটিশ ও সময় দিয়ে পুকুর মৎস্যচাষের আওতায় আনার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। Fish Quality Control Act, ১৯৮৩ হিসেবে পরিচিত The Fish and Fish Products Ordinance (Inspection and Quality Control) ১৯৮৩ সংশোধিত হয় ১৯৮৯ সালে। Shrimp Culture Tax Act, ১৯৯২ অনুসারে কেউ চিংড়িচাষ এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ ও খাল খননের দ্বারা উপকৃত হলে সরকার তার ওপর কর বসাতে পারবে। বেসরকারি খাত কার্যত গ্রাম ও শহরের বাজার, পাইকারি ও খুচরা বাজারের মাধ্যমে মাছ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। জেলেরা সাধারণত ব্যবসায়ী/দালালের কাছে তাদের মাছ বিক্রি করে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আহরণ ও বিপণনের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ মৎস্যজাত পণ্য যুগিয়ে থাকে। চট্টগ্রামে একটি মৎস্য বন্দর আছে। এছাড়া সমুদ্র থেকে ধরা মাছের জন্য কক্সবাজার, বরিশাল, খেপুপাড়া, পাথরঘাটা ও খুলনায় এবং স্বাদুপানির মাছের জন্য রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, রাজশাহী ও ডাবোরে অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে।

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব মানুষ স্বল্পমূল্যের সরঞ্জাম ও জাল দিয়ে উপকূলে ও সমুদ্রের অগভীর পানিতে মাছ শিকার করে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সমাজের প্রধান ধারার মানুষের চেয়ে কম সুবিধাভোগী। এমনকি কয়েক দশক আগেও শুধু নিম্নবর্ণের হিন্দু, যেমন জলদাস (আক্ষরিক অর্থে জলের দাস), মালো, কৈবর্ত, বর্মণ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মাছ শিকার করত। বেকারত্বসহ অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে অনেক মুসলমানও এ পেশায় ঢুকছে। বিগত দুই দশকে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ লক্ষে পৌঁছেছে। একই সময়ে যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা ২০০ থেকে ১০,০০০ হয়েছে এবং ৪৬,০০০ অযান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা ১৪,০০০-এ নেমে এসেছে। প্রায় ৮০% মৎস্যজীবী নিরক্ষর এবং এদের মধ্যে প্রায় ৭০% ভূমিহীন। ব্যবসায়ী শ্রেণী এদের দাদনের (বছরে অনেক বেশি সুদে) শর্তে অর্থ ঋণ দেয়, যা মৎস্যজীবীদের কখনও স্বনির্ভর হতে সাহায্য

করে না। কিছু মৎস্যজীবীর নিজস্ব নৌকা থাকে, কেউ কেউ নৌকা ভাড়া করে, অধিকাংশই মজুরির বিনিময়ে শ্রমদান করে। কোন কোন মৎস্যজীবী মাছধরার নৌকায় বাস করে এবং সঙ্গে রান্নার স্টোভ থাকে। বাংলাদেশে ছোট মৎস্যজীবীরাই ধৃত মোট মাছের প্রায় ৯০ ভাগ শিকার করে। মৎস্যজীবীরা মাছ শিকারে অক্টোবর-মার্চে সমুদ্রে এবং সমুদ্র উত্তাল থাকলে নদী ও হ্রদে যায়। সামুদ্রিক মৎস্য শিকার মৌসুমের সময়সীমার স্বল্পতাই বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের প্রধান সমস্যা, কারণ এরা এসময়ই সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে থাকে। [মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম]

মাছের পুষ্টি মাছের বৃদ্ধি, জৈবনিক কার্যাদি ও পরিপোষণের উদ্দেশ্যে খাদ্যগ্রহণ ও সেগুলির ব্যবহার প্রক্রিয়া। অন্যান্য প্রাণীর মতো মাছেরও অভ্যন্তরীণ বিপাকক্রিয়া ও বাহ্যিক কর্মকান্ডে শক্তি যোগানোর জন্য খাদ্যের কতিপয় জৈব উপাদান আবশ্যক হয় এবং খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলি মাছের দেহ বৃদ্ধিতে কাজে লাগে। খাদ্যের এই উপাদানগুলি লিপিড, প্রোটিন ও শ্বেতসার; মাছ এগুলিকে বিপাকীয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শ্বেতসার বিপাকীয় শক্তির একটি উৎস ব্যতীত খাদ্য উপাদান হিসেবে এর তেমন আবশ্যকতা নেই।

গবেষণাগারে পরিচালিত পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন কার্প, তেলাপিয়া, ক্যাটফিশ ইত্যাদি চাষকৃত মাছের উত্তম পুষ্টির জন্য খাদ্যের প্রোটিন ৩৫-৪৫% শক্তি যোগায়। কাজেই নির্বাচিত খাদ্যে ৩০-৪০% প্রোটিন থাকলে তা মাছের পুষ্টির চাহিদা মেটায়, তবে মাছের উত্তম বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনে সব ধরনের প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড থাকাও আবশ্যক।

একইভাবে, মাছের জন্য ভিটামিনেরও প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এটি স্পষ্ট যে, মাছের উত্তম পুষ্টির জন্য চাই শক্তির উৎস হিসেবে সুষমখাদ্য, যাতে থাকে অপরিহার্য সব ফ্যাটি এসিড, সবগুলি আবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডসহ প্রোটিন এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

বাংলাদেশে বার্ষিক প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদনের জীববস্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে পারে না। কাজেই মাছচাষের মাধ্যমে অধিক মাছ উৎপাদনের উপর চাপ পড়ছে, আর বিভিন্ন উপাদান সহযোগে সম্পূরক সুষমখাদ্য যুগিয়ে সঠিকভাবে মৎস্যচাষেই কেবল তা সম্ভব। সম্পূরক খাদ্যে 'ফিশ-মিল' একটি আদর্শ উপাদান হলেও এটি খুবই দামি এবং বাংলাদেশের সাধারণ মাছ চাষীদের জন্য সহজলভ্য নয়। সয়াবিনের ময়দা, সর্ষের খৈল, তিলের গুঁড়া, ধান ও গমের ভুসি, ক্ষুদিপানা ও ঘাস ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে লভ্য উপাদান থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তা খাবার তৈরির চেষ্টা চলছে।

মাছের খাদ্য (Fish feed) মৎস্যখামারে মাছের পুষ্টির জন্য খাদ্য হিসেবে সরবরাহকৃত সামগ্রী। নিবিড়, এমনকি অর্ধ-নিবিড় চাষপদ্ধতিতেও মাছের উচ্চতর ঘনত্ব বজায় রাখা হয়। মাছের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত না হওয়ার ফলে মাছের কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি ও অপুষ্টিজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ জরুরি হয়ে ওঠে। পাখনাওয়ালা (finfish) ও খোলকবিশিষ্ট (shellfish) মৎস্য সম্পদের সফল চাষের অন্যতম অত্যাবশ্যক ও প্রধান কার্যকর ব্যবস্থা মৎস্য খাদ্য। এ ধরনের মৎস্যচাষে খাদ্যের দাম পরিচালন ব্যয়ের ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই চাষকৃত বিশেষ প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে কৃত্রিম খাদ্য নির্বাচন ও উপযুক্ত প্রক্রিয়া কৌশলসহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মাছ সুষম পুষ্টিযুক্ত খাদ্য ভাল খায়, যা জীববস্তু উৎপাদনের জন্য সুষ্ঠুভাবে বিপাককৃত হয়। পক্ষান্তরে নিম্নমানের খাদ্য মাছের বৃদ্ধি ও পানির মানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন পানিতে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি জমা হয়, যা মাছ ও চিংড়িকে রোগপ্রবণ করে তোলে।

বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক মানসম্পন্ন মৎস্যখাদ্য তৈরির খামার রয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন আকারের মাছ/চিংড়ির জন্য প্রধানত বড়ি-খাবারই প্রস্তুত করে। প্রধান কারণ, মানসম্পন্ন মৎস্যচূর্ণের অভাব, যা মৎস্যখাদ্যের প্রধান উপাদান। কাজেই, খামার মালিকদের উন্নতমানের খাদ্য তৈরির জন্য বিদেশ থেকে মৎস্যচূর্ণ আমদানি করতে হয়। অবশ্য বাংলাদেশে মাছের খাদ্য প্রস্তুতকারক কতিপয় বড় প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন মৎস্যখাদ্য, চিংড়িখাদ্য, বিশেষ চিংড়িখাদ্য এবং পাঙ্গাশ, মাগুর ইত্যাদির জন্য বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করে। এগুলির মধ্যে সৌদি-বাংলা ফিশ ফিড লিঃ, ভালুকা, ময়মনসিংহ; প্রগতি ফিশ ফিড লিঃ, খুলনা; নিরিবিলি ফিড, চট্টগ্রাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাছে শক্তিসঞ্চারক (Fish energatics) যথাযথ বৃদ্ধির জন্য মাছে শক্তিভরণ, শক্তিব্যয় ও শক্তি মজুদের মধ্যেকার ভারসাম্য প্রয়োজন। এটি শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া, যা দ্বারা জীবন্ত প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে যান্ত্রিকভাবে শক্তির রূপান্তর ঘটে। প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন পরিবেশে মাছের খাদ্য গ্রহণ ও দেহ বৃদ্ধির হারের মধ্যেকার সম্পর্ক

সমীক্ষায় শারীরবৃত্তিক কাঠামো যোগায়। বর্তমানে মাছচাষে মাছের জৈব শক্তিসঞ্চারণ ও বৃদ্ধি বিষয়ক সমীক্ষার ফলাফল হাতিয়ার হিসেবে ক্রমেই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে মাছের জৈব শক্তিসঞ্চারণ বিষয়ক গবেষণা, সম্ভবত সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং গবেষক-বিজ্ঞানীদের আগ্রহের অভাবে যথার্থ গুরুত্ব পায়নি। বিদেশী সহায়তায় গবেষণাগার ও মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ কার্প (Cyprinus carpio) ও কিছু অন্যান্য কার্প (Labeo rohita, Catla catla) ইত্যাদির জৈব শক্তিসঞ্চারণ মডেল তৈরি করা হয়েছে। [সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী]

আরও দেখুন বিদেশী মাছ; মৎস্য উৎপাদন; মৎস্যজীবী; মৎস্যযান; মাছ ধরার সরঞ্জাম।

এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৬:১৮টার সময়, ৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে।

গোপনীয়তার নীতি বাংলাপিডিয়া বৃত্তান্ত দাবিত্যাগ প্রবেশ

Powered By MediaWiki